'মাসুদ রানা' সিরিজের ২৬০টি ও 'কুয়াশা' সিরিজ ৫০টি রহস্য উপন্যাসের কপিরাইট: শেখ আব্দুল হাকিম বনাম কাজী আনোয়ার হোসেন

বিগত ২৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে শেখ আব্দুল হাকিম দেশের নন্দিত রহস্য-রোমঞ্চ উপন্যাস 'মাসুদ রানা' সিরিজের ২৬০ টি এবং 'কুয়াশা' সিরিজের ৫০টি বইয়ের লেখক হিসেবে মালিকানাস্বত্ব দাবি করে সেবা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী কাজী আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের ৭১ ও ৮৯ ধারা লঙ্ঘনের এক অভিযোগ বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসে দাখিল করেন।

অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতিতে ১১ ও ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৪ঠা নভেম্বর ২০১৯ তারিখে উক্ত অভিযোগের বিষয়েতিন দফা শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। শুনানীতে উভয়পক্ষ স্বপক্ষে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে প্রতিপক্ষ লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের উক্ত লিখিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাদী পুনরায় নিজের স্বপক্ষে লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিল করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত যুক্তির বিষয়ে প্রতিপক্ষ পুনরায় লিখিত যুক্তিতর্ক পেশ করেন।

বিষয়টি বেশ জটিল এবং দেশের প্রকাশনা শিল্পের ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশকের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব বিবেচনা করে, এর সন্তোষজনক ও সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে উক্ত অভিযোগের বিষয়ে এদেশের বিখ্যাত ও প্রথিতযশা কয়েকজন লেখক ও প্রকাশক এবংসেবা প্রকাশনীর সাবেক ব্যবস্থাপকের লিখিত মতামত চাওয়া হয়। তন্মধ্যে লেখক জনাব বুলবুল চৌধুরী ও জনাব শওকত হোসেন, প্রচ্ছদ শিল্পী হাসেম খান এবং ব্যবস্থাপক ইসরাইল হোসেন খান লিখিত মতামত প্রেরণ করেন।

প্রতিপক্ষের যুক্তি :

- অভিযোগকারীর ভাষ্য মতে ১৯৬৭ সন থেকে সেবা প্রকাশনীর ব্যানারে মাসুদ রানা ও কুয়াশা সিরিজ এর বই লিখেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সেবা প্রকাশনী নিয়মিত চাকরি করতেন। সে চাকরিতে নিয়োজিত থেকে মালিকের নির্দেশে যে সকল বই লিখেছেন, তা তিনি স্বত্ব হিসেবে অধিকার করতে পারেন না, বইগুলি তার। তাই, কপিরাইট আইন মতে লঙ্ঘন জনিত অভিযোগটি অচল। তাই অভিযোগটি খারিজ যোগ্য বটে।

- জাল (মাসুদ রানা সিরিজ) : সর্বস্বত্ব প্রকাশকের। তবে উহার লেখক: শেখ আ: হাকিম। সম্পাদনায়: কাজী আনোয়ার হোসেন, প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, প্রকাশিকা: ফরিদা ইয়াসমিন, সেগুন বাগান, বর্তমানে : ২৪/৪, কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, ঢাকা-১০০০। বাদীর ভাষ্যমতে এই বইটি তিনি আংশিক পেমেন্ট হিসাবে কিছু টাকার বিনিময়ে মাত্র একবার মুদ্রণের জন্য প্রকাশককে প্রদান করেন। উক্ত বইটি যেহেতু নকল করে প্রকাশ করা হয়নি। সেহেতু লঙ্ঘন করার প্রশ্ন উঠে না তাই অভিযোগটি খারিজ হইবে।

- "মাসুদ রানা সিরিজ এবং কুয়াশা সিরিজ সকল বইয়ের সর্বস্বত্ব প্রকাশকের। প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন: সেগুন বাগান/সেবা প্রকাশনী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক হিসাবে অন্য কাহার নাম প্রকাশ করিলে পাঠক বিভ্রান্তি প্রকাশ করেন। যাহা 'অটল সিংহাসন' নামের বইয়ের শেষ পাতায় উল্লেখ রহিয়াছে"। অভিযোগকারীর নিজ স্বীকৃত কথা মতে "তাহার কোন ইংরেজী দক্ষতা নাই"। তিনি কিভাবে ইংরেজী বইয়ের গল্প অবলম্বনের কাহিনী তৈরী করিবেন। উহা প্রকাশকের নির্দেশনায় তিনি লিখিয়াছেন। তাই অভিযোগটি খারিজ যোগ্য।

- অভিযোগকারী যে সকল বই প্রতিপক্ষের অনুপ্রেরণায় এবং নিয়োগ কর্তার নির্দেশনায় বই লিখেছেন, সেই সকল বইয়ের স্বত্বাধিকারী কাজী আনোয়ার হোসেন (প্রতিপক্ষ) ব্যতীত অন্য কেহ উহার দাবি করতে

পারে না। তদুপরি সেই সকল বইয়ের ভিতর লেখক হিসাবে অভিযোগকারীর নাম রহিয়াছে। উহা ছাড়া অন্য কোন বই অভিযোগকারী দাবি করিতে পারে না। তাই অভিযোগকারী মিথ্যা উক্তি বর্ণনা করিয়া বিজ্ঞ আদালতকে বিভ্রান্ত করার জন্যে অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন। তাই উহা খারিজ হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যেই সকল বইয়ের ভিতর উল্লেখ থাকে সর্বস্বত্ব প্রকাশক, সেই সকল বইগুলির স্বত্ব কিভাবে অভিযোগকারী দাবি করিতে চায়। বিজ্ঞ আদালতের নিকট তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।

- সব্যসাচী (কুয়াশা সিরিজ-১০)-এর লেখক শেখ আব্দুর রহমান। তাই এর লেখক হিসাবে তিনি দাবি করিতে পারেন না। তবে অভিযোগকারী কুয়াশা সিরিজ এর ৫০টি (কম-বেশী) বই লিখেছেন, সেই সকল ৫০(পঞ্চাশ) টি বইয়ের নাম অত্র অভিযোগ দরখাস্তে উল্লেখ নাই। সুতরাং তিনি অসত্য বক্তব্য প্রদান করিয়া বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার মহোদয়কে বিভ্রান্ত করার পায়তারা করিতেছেন। তাই দরখাস্তটি খারিজযোগ্য।

- খুনে মাফিয়া: হ্যাডালি চেজের বই হইতে খুনে মাফিয়া দাঁড় করাই। সেটি কাজী আনোয়ার হোসেন পড়ে পটভূমিতে বিভিন্ন রংয়ের সমারোহ ঘটিয়ে তার উপর সংশোধনী পরামর্শ দেন, নিজেও দুই-চার টা লাইন যোগ করেন। উহার ভিতর একটা-আধটা বানান ভুল ধরেন। এইভাবে খুনে মাফিয়া লিখি। এভাবে আমার প্রথম মাসুদ রানা সিরিজ এর বই জাল এবং মাসুদ রানা সিরিজের শেষের বই খুনে মাফিয়া এর মাঝখানে কম-বেশী ২৬০টি বই লিখেছেন। কথাটি সত্য নহে। কোন ব্যক্তি কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের দাবি করিতে হইলে তাহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অভিযোগ পত্রে দিতে হইবে। ফলে, বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার মহোদয়কে ২৬০টি বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক বই উপস্থাপন না করিয়া মিথ্যা উক্তি দিয়ে আদালতকে বিভ্রান্তি করিয়াছেন। তাই অভিযোগকারীর মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে দরখাস্তটি খারিজ হইবে।

- মিশন তেল আবিব: (মাসুদ রানা সিরিজের ৩৪৩নং বই) উহা নিক কাটার বই হইতে লেখা হইয়াছে। কথাটা সত্যি। তবে উহা আরেকটা বইয়ের সাহায্যে লেখা হইয়াছে, উহা প্রকাশক বলতে পারবে না। এই কথাটা সত্যি নহে। কারণ: তিনি প্রথমে বইয়ের নাম, তারপর কোন অংশ হইতে লিখা হইয়াছে, উহার নাম দিয়েছেন। তাই এই উক্তিটি তাহার হাস্যকর বটে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে: কলা ছুল্লা কেন? বুঝাইয়া দেও।

- ইতিপূর্বে শেখ আব্দুল হাকিম: বিগত ৩১-০৩-২০১০ইং তারিখে এবং ইফতেখার আমিন: ০১-০৪-২০১০ইং পালাও রানা বই স্বত্বাধিকারী হিসাবে অত্র আদালতে প্রতারনা অভিযোগ ও প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়া দাখিল করিয়াছেন। সেই অভিযোগে কাজী আনোয়ার হোসেন দুইটি জবাব দাখিল করিয়াছেন। যাহা ২৯-০৪-২০১০ইং তারিখে শূনানীর তারিখ হিসেবে ধার্য্য হয়। উক্ত শুনানীতে প্রতারনার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় পুন:রায় কপিরাইট আইনের ৭১ ও ৮৯ ধারা মতে লংঘন এর অভিযোগ আনায়ন করিয়াছেন। উহা ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি এর ১১ ধারা মতে খারিজ যোগ্য।

- অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কপিরাইট আইনের ৭১ ও ৮৯ ধারার লংঘন জনিত অভিযোগ আনায়ন করিয়াছেন। ধারা-৭১: কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কপিরাইট এর মালিক বা রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত বা অনুরূপভাবে প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত বা এই আইনের অধীন কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত লংঘনপূর্বক: ক ও খ.... উক্ত ধারায় প্রতিকার গ্রহণ করিতে হইলে কপিরাইট আইনের ৮১ ধারা লক্ষ্য করিতে হইবে। লঙ্ঘনজনিত প্রত্যেক দেওয়ানি মোকদ্দমা কার্যধারার উপর নির্ভরশীল। অন্য কোন আদালতে উহা চলতে পারে না।ধারা-৮৯: প্রনেতা কর্তৃক মিথ্যা কর্তৃত্ব আরোপ: উক্ত ধারা বিচার্য বিষয় সম্পর্কে ৯২ ধারা দেখতে হইবে। উহা ছাড়া অন্য কোন আদালতে উহার বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

- অভিযোগকারীর স্বীকৃতি মতে তিনি ১৯৬৭ সাল হইতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কাজী আনোয়ার হোসেন নির্দেশনায় মাসুদ রানা ও কুয়াশা সিরিজ এর উপর বই লিখিয়াছেন এবং তিনি ২০১০ সালের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য টাকা নগদেগ্রহণ করিয়াছে।

- অভিযোগকারীর স্বীকার উক্তি মোতাবেক: আমি কম-বেশী ২৬০টি মাসুদ রানা বই লিখিয়াছি এবং ৫০টি কুয়াশা সিরিজ লিখিয়াছি। এসব বই কাজী আনোয়ার হোসেন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করিয়াছেন। যুক্তি হইল যে, তাহার নামে লিখলে লেখকরা অনেক বেশী টাকা পাবে। তার ভাষ্য ছিল টাকা দিয়ে বইগুলি কিনে নিচ্ছেন। কিন্ত কপিরাইট আইনে বলা হয়েছে লিখিত চুক্তি ছাড়া কোন পান্ডুলিপি ছাপা যায় না। কেনার প্রশ্নই উঠে না। প্রতিপক্ষের সংগে অভিযোগকারীর কোন চুক্তি হয়নি।

- উপরোক্ত স্বীকৃতি মতে কাজী আনোয়ার হোসেন এর নির্দেশনায় অভিযোগকারী মাসুদ রানা ও কুয়াশা সিরিজ লিখিয়াছেন। তাই তিনি ঐ সকল বইয়ের কোন চুক্তি করেননি।সর্বোপরি কপিরাইট লঙ্ঘন বলতে কি বোঝায়, তাহা তাকেই প্রমাণ করিতে হইবে। তাহারই ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ বিজ্ঞ আদালতে আরো যুক্তি প্রদর্শন করিবেন।

অভিযোগকারীর যুক্তি :

- প্রতিপক্ষের উকিল কর্তৃক খুব অযত্নের সঙ্গে জবাব লেখা হয়েছে, অনেক জায়গা দুর্বোধ্য, এলামেলো ও দুর্বলভাবে লেখা। তাঁদের বক্তব্য এবং আমার বক্তব্য এক জায়গায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় আমার প্রতিপক্ষ কি বলতে চান তা পরিষ্কার হচ্ছে না।আপত্তিটি পড়ে মনে হলো আত্মপক্ষ সমর্থনে তাদের আসলে কিছুই বলবার নেই, তাই অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এবং প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, আমার বক্তব্যকে বিকৃত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।প্রতীয়মান শব্দটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে গা বাঁচানোর জন্যে, বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস মাত্র। তাঁরা বলতে পারছেন না যে সেবা প্রকাশনীতে আমি চাকরি করার সুবাদে মাসুদ রানা এবং কুয়াশা সিরিজের অতগুলো বই লিখেছি। কারণ এই নির্ভেজাল মিথ্যে কথাটা বললে তাঁদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, মাসে মাসে বেতন তোলার রসিদ, ছুটির দরখাস্ত, চাকরি ছাড়ার আবেদন-পত্র ইত্যাদি বহু কিছু দেখাতে হবে। যেহেতু সে-সবের কোনো অস্তিত্ব নেই, বলতে পারছেন না যে আমি সেবা প্রকাশনীতে লেখার চাকরি করতাম, তার পরিবর্তে বলছেন অনুভূত বা বোধগম্য হয় (প্রতীয়মান শব্দের এটাই মানে)।

- ২০১০ সালে আমার অভিযোগ এবং দাবিছিলপ্রকাশক এবং লেখক কাজী আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে, এর প্রেক্ষিতে তখন তিনি কপিরাইট অফিসে একটা জবাব দিয়েছিলেন, তাতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন আমি একটিও মাসুদ রানা এবং একটিও কুয়াশা এবং তাঁর নামে অন্য কোনো ধরনের কোনো বই লিখিনি। এখন, টাকা না দেওয়ার কৌশল হিসাবে, দশ বছর পর, ভোল পাল্টে বলতে চাইছেন চাকরি করা অবস্থায় (বিভ্রান্তিকর ভাষায়) লিখেছি। সেবা প্রকাশনীতে যারা লেখালেখি করতেন; আমি শেখ আবদুল হাকিম, রকিব হাসান, নিয়াজ মোরশেদ, আসাদুজ্জামান, রওশন জামিল, শওকত হোসেন ও ইফতেখার আমিন (ইনি '৯১ সাল থেকে মাসুদ রানা লেখা শুরু করেন) খন্দকার মাজহারুল করিম ও অন্যান্যরা, সবাই ফ্রিলান্স ছিলেন এবং যথেষ্ট নামকরা লেখক ছিলেন যাদের মধ্যে তিনজনকে (আমি, রকিব হাসান ও ইফতেখার আমিনকে) কাজী সাহেব বিশেষ উদ্দেশ্যে একে একে সেবা প্রকাশনী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছেন। তিনি অনেক সাক্ষাৎকারে; বিশেষ করে ১৯.০৭.২০০৮ প্রথম আলোয় দেয়া বিশাল সাক্ষাৎকারে মাসুদ রানা সিরিজের লেখকদের "লেখক" এবং নিজেকে "সম্পাদনাকারী" বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব বিবাদীর পক্ষ থেকে নতুন করে তোলা এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এ প্রসঙ্গে আমি ২০০৭ ও ২০০৮ সালে নিজের লেখা কয়েকটি মাসুদ রানা মুদ্রণের জন্যে প্রেসকে সেবা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে দেয়া প্রিন্ট অর্ডার কপিরাইট বোর্ডের সামনে উপস্থাপন করার জন্যে জোর দাবি জানাচ্ছি।

• কুয়াশা এবং মাসুদ রানা সিরিজের যে-সব বই আমি লিখেছি তার একটা তালিকা এই উত্তরের সঙ্গে দাখিল করা হলো। জাল-এর লেখক শেখ আবদুল হাকিম, অথচ সর্বস্বত্ব কাজী আনোয়ার হোসেনের, এটা কীভাবে সম্ভব হলো তার সন্তোষজনক জবাব কাজী সাহেবকেই দিতে হবে। আমার সংগৃহীত সেবা প্রকাশনীর ২০১০ সালের মূল্য তালিকাতেও বইটির প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টা উল্লেখ আছে, এবং এককভাবেও যে কয়েকবার ছাপা হয়েছে তাও আমি প্রমাণ করতে পারব। অথচ আরেক উকিল নোটিশে কাজী সাহেব বারবার দাবি করেছেন, মাসুদ রানার সিরিজের জাল বইটির মান খারাপ হওয়ায় সেল খুব খারাপ হয়েছিল বিধায় বইটি দ্বিতীয়বার তিনি এককভাবে মুদ্রণ করেননি। জাল এককভাবে শুধু একবার নয়, একাধিকবার ছাপা হয়েছে–এবং সে বাবদে সেবা প্রকাশনীর কাছে আমি কয়েক লাখ টাকা পাব–তার প্রমাণ আমার কাছে আছে, প্রয়োজন হলে আমি সেটা দেখাতে পারব।আমি নিজের নাম ছাপাতে নিষেধ করা সম্পর্কে কী বলেছি তা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। অটল সিংহাসনের শেষ দিকে পাঠক অন্য লেখককে দিয়ে মাসুদ রানা লেখানোর জন্যে কাজী আনোয়ার হোসেনকে তিরস্কার করছেন, কিন্তু কই, কাজী সাহেব তো অভিযোগ অস্বীকার করে কিছু বলেননি। কেন?

• "আমি সেরকম ইংরেজি জানি না" আর "আমার কোন ইংরেজি দক্ষতা নাই"– এই দুটি কথার মধ্যে অনেক পার্থক্য। প্রতিপক্ষ আমার বলা কথা বিকৃত করে এটাই প্রমাণ করছেন তথ্য বিকৃত করা ছাড়া তাদের গা বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই। আশা করি তথ্য বিকৃতির এই অপপ্রয়াস বিজ্ঞ আদালতের চোখ এড়িয়ে যাবে না। তারপরও যদি প্রমাণের কথা আসে তাহলে বলব : আমার লেখা প্রথম মাসুদ রানা 'জাল'-এ আমার নাম রয়েছে। মাসুদ রানার প্রতিটি বইয়ের মতো ওটাও ইংরেজি বইয়ের ছায়া অবলম্বনে লেখা। আমি ইংরেজি না জানলে বইটা লিখলাম কিভাবে? যে বইয়ের কপিরাইট ইতোমধ্যেই আমি পেয়ে গেছি? (বিজ্ঞ আইনজ্ঞ মহোদয়ের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি আমি খুবই বিখ্যাত একটা আইনবিষয়ক বইও অনুবাদ করেছি, সেটার নাম নূরেমবার্গ: ঈভিল অন ট্রায়াল, লেখক–জেমস ওয়েন।)

• কাজী সাহেব যে মাসুদ রানা লিখতেন না, সেটা তাঁর ১৬.০৯.১৯৭২-এ অটোগ্রাফ দেয়া মাসুদ রানা সিরিজের: প্রমাণ কই? বইয়ের আলোচনা বিভাগে সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত আছে। তাতে যশোরের কসবা থেকে জনৈক ফারুক লিখেছিলেন : "বড় দুঃখ লাগে যখন দেখি লেখকের পরিবর্তে সম্পাদক রূপে আবির্ভূত হতে আপনার মত অপ্রতিদ্বন্দ্বী রহস্য পুজারীকে বাংলার রহস্যাঙ্গনে। কাজী দা, এ্যাডভাইস নয়, রিকোয়েস্ট, সম্পাদনা ছেড়ে নিজে লিখুন রানা, কুয়াশা, সেই সাথে অন্যান্য উপন্যাস।" তার জবাবে কাজী সাহেব মারফতী জবাব দিয়েছিলেন: রহস্য পত্রিকা খুব খারাপ লাগত বুঝি?

বিজ্ঞ আদালত, এখানে একজন লেখককে সম্পাদনা ছেড়ে নিজে লেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। লেখকের কি করা উচিত? কাজী আনোয়ার হোসেনই যদি লেখক হতেন তাহলে এই ভুল তিনি মেনে নিলেন কিভাবে? কেন বললেন না আমিই মাসুদ রানা বা কুয়াশা লিখি, সম্পাদনা করি না।লিখে খাই, কাজেই আমি একজন পেশাদার লেখক, তাই কারও অনুপ্রেরণার প্রয়োজন পড়ে না আমার। চাইলে যে কোনো সময়, যে কোনো বিষয়ে, বিদেশি কোনো বইয়ের সাহায্য ছাড়া, কিংবা বিদেশি বইয়ের সাহায্য নেওয়া সত্ত্বেও, পাঠককে তৃপ্ত করতে সক্ষম এমন লেখা অনর্গল লিখতে পারি আমি। লেখাটা আমার ভেতর থেকে আপনাআপনি চলে আসে। শুধু কাজী সাহেব না, আমার কাছাকাছি বয়সের যে কোনো ব্যক্তিকে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলবে পারব, বিষয় নিয়ে একমত হবার পর আসুন আমরা একই জায়গায় লিখতে বসি, দেখুন কেমন ঢাউস একটা উপন্যাস লিখে দিই।

• কাজী সাহেব আমার নিয়োগ কর্তা নন, আমি তাঁর চাকরি করিনি। বইয়ের ভেতরে সর্বস্বত্ব প্রকাশকের লেখা থাকলেই সেটা প্রকাশকের হয় না। যেহেতু তিনি নিজেই বারবার বলেছেন তিনি লেখক নন, সে ক্ষেত্রে

আমার লেখা বইগুলো কীভাবে তাঁর হলো, কোন ক্ষমতাবলে তিনি এক বই বারবার রিপ্রিন্ট করে সমুদয় টাকার মালিক বনে গেলেন, তা তাঁকেই প্রমাণ করতে হবে। তিনি কি কপিরাইট অফিস থেকে সব বই কপিরাইট করিয়ে নিয়েছিলেন? তিনি কি জানেন সর্বস্বত্ব প্রকাশকের লেখার পূর্বশর্ত কী? প্রথম কথা, এই দরখাস্তের ১০ বছর আগেও কপিরাইট অফিসে আমি কাজী সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছি, সেখানে আমার লেখা মাসুদ রানা এবং কুয়াশার তালিকা অবশ্যই দেওয়া ছিল। তাছাড়া, আমি হলফনামার মাধ্যমেও তখনকার রেজিস্ট্রার মহোদয়কে সবিস্তারে জানিয়ে ছিলাম কি কি বই আমি লিখেছি।

• কুয়াশা-১০ সম্পর্কে মূল সত্য কাজী সাহেব খুব ভালো করে জানেন, ওটা আমারই লেখা। তবে এটাই সত্যি যে বইটা আমার বড় ভাই শেখ আবদুর রহমানের ছদ্মনাম সব্যসাচী নামে ওটা ছাপা হয়েছিল।

• কুয়াশা সিরিজের প্রায় সবগুলো বইয়ের কোনো নাম রাখা হয়নি, শুধু সংখ্যা লেখা হয়েছে। রাহাত খান লিখেছিলেন–মানিকপুর হত্যা রহস্য, বইয়ের প্রচ্ছদে সেটা ছাপা হয়েছে। (কুয়াশা-২২ (সম্ভবত), ২৩, ২৬, ২৭, ২৮ এবং ২৯ ইউসুফ ফারুকের নামে ছাপা হয়েছিল।) তারপর থেকে কুয়াশা ৬৫ পর্যন্ত আমারই লেখা, এগুলো মাঝখানে দু'একটা বই অন্য কেউ লিখে থাকতে পারে। কুয়াশা ৭৭ আর ৭৮ আমার লেখা–হলুদ মৃত্যু এবং কিলার। তবে ৬৫ থেকে ৭৫-৭৬ পর্যন্ত কারা লিখেছেন এখনই আমি বলতে পারব না–ওগুলোর মধ্যে কিছু নিশ্চয় আমিও লিখেছি, তবে ঠিক কোনগুলো জানতে হলে সময় লাগবে। আমি লেখার পর যুগের যুগ কেটে গেছে, ওগুলোর নামও ছিল না, তার ওপর এই বইগুলোর কপিরাইট নিয়ে আমাকে হেনস্থা করা হবে এটা কখনো ধারণা করিনি বিধায় সব তথ্য মনে গেঁথেও রাখিনি। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়নি, এর মানে রেজিস্ট্রার মহোদয়কে আমি বিভ্রান্ত করবার পায়তারা করছি? আমার প্রতিপক্ষের নিশ্চয়ই জানার কথা যে ২৬০টা (কমবেশি) মাসুদ রানা এবং ৫০টার মতো কুয়াশা আমার লেখা দাবি করে ২০১০ সালে আমি কপিরাইট অফিসে তালিকা দাখিল করেছিলাম। আমার জানামতে সেবা প্রকাশনীর কর্মচারীরা কপিরাইট অফিস থেকে আমার দেওয়া হলফনামাও সংগ্রহ করেছেন, অথচ তারপরও বিনা কারণে এসব প্রসঙ্গ তুলে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।কেন কথাটা সত্যি নয়? কোনো যুক্তিতে? কাজী সাহেব নিজে যেখানে বলছেন শেখ আবদুল হাকিম মাসুদ রানা লিখেছেন, এক জায়গায় নয়, বহু জায়গায়, বহুবার, তাহলে আমি তাঁরই কথা পুনরাবৃত্তি করলে সেটা মিথ্যে হবে কেন, কোন যুক্তিতে?

আবার জিজ্ঞেস করি, কেন কথাটা সত্যি নয়? খুনে মাফিয়া আমি লিখেছি, লেখার পর পাণ্ডুলিপিটি আমি ই-মেইলযোগে কাজী সাহেবের জি-মেইলে পাঠাই। সেটি তিনি পড়েন, পটভূমিতে বিভিন্ন রংয়ের সমারোহ ঘটিয়ে তার ওপর সংশোধনীর পরামর্শ দেন, নিজেও দু'চার লাইন যোগ করেন, এক-আধটা বানান ভুল ধরেন, তারপর আমার কাছে ফেরত পাঠান। সেই ফেরত পাঠানো কপি, তাঁর সম্পাদনা ও মন্তব্যসহ আমার পিসিতে আজও সংরক্ষিত আছে, সেটা আমি শুদ্ধ করি, তারপর কাজী সাহেবের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো পাঠাই–এবং সেটাই তিনি "খুনে মাফিয়া" নামে প্রকাশ করেন। এর মধ্যে ছিটেফোঁটাও মিথ্যে নেই, তাহলে কেন বলছেন কথাটা সত্যি নয়? সেই পাণ্ডুলিপির ওপরে কাজী সাহেবের ৩০ জুন ২০০৮ তারিখের কম্পোজ করা চিঠিও রয়েছে।

• আমার লেখা মাসুদ রানার তালিকা ২০১০ সালেই কপিরাইট অফিসে জমা দেয়া হয়েছিল। তালিকার খসড়া কপি আমার কাছে আছে। সেটা আমরা কপিরাইট অফিসে আবার জমা দিচ্ছি। নাম উল্লেখ না করার মতো সামান্য কারণে আমার দরখাস্ত যদি খারিজ হয়ে যায়, তাহলে আমার লেখা ৩০০-রও বেশি বই নিজের নামে ছেপে এবং আমি লিখেছি স্বীকার করে, কাজী সাহেব যে গুরুতর অপরাধ করেছেন তাতে তো ওই মহাশয়ের যাবজ্জীবন জেল হয়ে যাওয়ার কথা! আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে এখানে উল্টোপাল্টা প্রলাপ বকা হচ্ছে। প্রথমত, কারণ হিসেবে যা বলছেন তা দুর্বোধ্য, বাক্য অসমাপ্ত রাখা হয়েছে, আবার বলা হচ্ছে হাস্যকর। আমি 'প্রকাশক বলিতে পারিবে না বলিনি', বরং বলেছি 'কাজী আনোয়ার হোসেন কি দ্বিতীয় বইয়ের

নাম বলতে পারবেন? পারবেন ওটার কোন কোন অংশ তিনি কাজে লাগিয়েছেন? হয় বলুন মিশন তেল আবিব লিখতে যে দ্বিতীয় বইটি আমি ব্যবহার করেছি সেটার নাম কি। আর নয়ত বলুন আপনারা নামটা জানেন না। তা না হলে কলা ছুল্লা কেন উল্টা বুঝাইয়া দেওন লাগব।২৬০-এর অধিক বইয়ের মধ্যে ১টা বইয়ের নাম উলেখ করার ক্ষেত্রে ভুল হতেই পারে, এটা এমন কোনো অপরাধ নয়। তাছাড়া পালাও রানা-এর একটা মীমাংসা যেখানে ২০১৪ সালে হয়ে গেছে বলে কাজী সাহেবের পক্ষ থেকেই উল্লেখ করা হচ্ছে, তা নিয়ে কুতর্ক তোলার উদ্দেশ্য আমার বোধগম্য হচ্ছে না। এই একটা বাদে আর সবগুলোর ক্ষেত্রে আমার দাবি বহাল থাকছে।আমার প্রাপ্য রয়্যালিটি; এবং সেই রয়্যালিটির টাকাই আমি একটা সময় পর্যন্ত গ্রহণ করেছি। যে-সব খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে রয়্যালিটির টাকা নিয়েছি, তাতে চোখ বোলালেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। যে-সব বিরাট বিরাট খাতায় লেখা আছে আমাকে রয়্যালিটি দেওয়া হলো, সেগুলো কোথায়? ওগুলো সামনে এলেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে আমি কোন বইয়ের জন্যে কত রয়্যালিটি পেতাম এবং আরও কত পাবো। ওই খাতাগুলো বের করুন, দেখিয়ে দিচ্ছি সেখানে কি লেখা আছে। রয়্যালিটি যে শুধু পেতাম তা নয়, কত সালে কত হারে রয়্যালিটি পেতাম সবিস্তারে তাও লেখা আছে–কবে ৪ পার্সেন্ট দিয়ে শুরু হয়ে ৫ পার্সেন্ট, তারপর ৬ পার্সেন্ট, তারপর ৭ পার্সেন্ট, তারপর আবার কমিয়ে ফের ৬ এবং ৫ পার্সেন্ট করা হলো। আবার কোনো কোনো খাতায় এও লেখা আছে যে শেখ আবদুল হাকিম এই বইগুলো আমার (কাজী সাহেবের, শামসুদ্দিন নওয়াব নামে) ছদ্মনামে লিখছেন ঠিকই, কিন্তু কপিরাইট ওঁনার (শেখ আবদুল হাকিমের) থাকবে। কথাটা লেখার পর কাজী সাহেব ছোট্ট করে সইও করেছেন, স্পষ্ট মনে আছে আমার। নগদ টাকা আমি গ্রহণ করেছি আর তাতেই আমার সব পাওনা আমি পেয়ে গেছি, একথা বলে কাজী সাহেব পার পাবেন না, ৪০-৪২ বছর ধরে আমাকে কিভাবে টাকা দেয়া হয়েছে, কিসের ভিত্তিতে, তাও প্রমাণসহ দেখাতে হবে।

- আমি ১৯৬৭ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অবশ্যই সেবা প্রকাশনীতে কুয়াশা এবং মাসুদ রানা সিরিজসহ অন্যান্য আরও অনেক বই লিখেছি। কাজী সাহেব আমাকে লেখবার প্রস্তাব দিলে টাকার প্রয়োজনে আমি রাজি হই এবং লিখতে থাকি, কথা ছিল প্রতিটি বইয়ের জন্যে একটা করে আলাদা চুক্তিপত্র তৈরি করা হবে, কিন্তু পরে তিনি এই কাজটা করেননি, প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিয়েছেন, 'কাগজের আর কি দাম, মুখের কথাটাই আসল।' অর্থাৎ চুক্তি আমি করিনি না, চুক্তি করাতে তাঁকে রাজি করানো যায়নি। ভদ্রলোক বলেছেন, '...মুখের কথাই আসল।' কপিরাইট আইন কপিরাইট অফিস জানে, আর জানেন বিজ্ঞ উকিল সম্প্রদায়। কপিরাইট অফিসকে গত দশ বছর ধরে আমি যখন আরও অনেক প্রমাণ সহ এ-কথাও বলেছি যে কাজী সাহেব বহু জায়গায় প্রকাশ্যে বলেছেন, 'তিনি আর মাসুদ রানা লেখেন না'; বলেছেন, 'শেখ আবদুল হাকিমের লেখা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই'; বলেছেন, 'এখন মাসুদ রানা আমি আর লিখি না'; বলেছেন, 'মাসুদ রানা এখন অনেকে লেখেন, তাঁদের মধ্যে শেখ আবদুল হাকিম, ইফতেখার আমিন, রকিব হাসান, কাজী মায়মুর হোসেনরা আছেন'; বলেছেন, 'তাঁরা সবাই বড় লেখক'; তখন অফিস থেকে আমাকে বলা হয়েছে অপরাধী নিজে যেখানে স্বীকার করছেন যে এই অবৈধ এবং বেআইনি কাজ তিনি করেছেন, তখন তো সেখানে অবশ্যই কপিরাইট লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে।

- এর আগে কপিরাইট রেজিস্ট্রার মহোদয়কে আমি জানিয়েছি যে প্রখ্যাত সংবাদিক রাহাত খান, শিল্পী হাশেম খান, প্রয়াত শাহাদাত চৌধুরী, প্রয়াত মাহমুদুল হক, শিল্পী রফিকুন নবী, স্বনামধন্য শাহরিয়ার কবির, অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, সুলেখক মাহবুব তালুকদার, সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তথা আগামী প্রকাশনীর স্বত্বধিকারী জনাব ওসমান গণি, সালাউদ্দিন বইঘরের সালাউদ্দিন ভাই, শিল্পী ধ্রুব এষ, সেবার একসময়কার প্রচ্ছদশিল্পী স্নেহভাজন আলিম আজিজ, বর্তমান প্রচ্ছদশিল্পী স্নেহভাজন বিপ্লব, কথাসাহিত্যিক বুলবুল চৌধুরি, অপর মাসুদ রানা লেখক ইফতেখার আমিন, তিন গোয়েন্দাখ্যাত রকিব হাসান, সময় চ্যানেলের নিয়াজ মোরশেদ, সাংবাদিক আসজাদুল কিবরিয়া, খসরু চৌধুরি, অনীশ দাশ অপু, শওকত

হোসেন, সেবা প্রকাশনীর এক সময়কার ম্যানেজার কুদ্দুস সাহেব, সেলস ম্যানেজার ইসরায়েল হোসেন, খন্দকার রেজোয়ানসহ অসংখ্য পাঠক, কর্মচারী এই সত্য এবং বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন যে আমি কুয়াশা এবং মাসুদ রানা সিরিজ লিখেছি। এবং পরবর্তীতে রেজিস্ট্রার মহোদয় আমার এই বক্তব্য কাজী আনোয়ার হোসেনকেও অবহিত করেছেন। এরপর কাজী আনোয়ার হোসেন যে উত্তর দেন তাতে এ-প্রসঙ্গে তিনি একটা কথাও বলেননি।জাতীয় পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কাজী সাহেব, অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন আমরা কজন মাসুদ রানা সিরিজ লিখি। এ বিষয়ে হঠাৎ করে তাঁর নীরবতা কি অর্থ বহন করে?

উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ :

অভিযোগে আবেদনকারী নিজেকে রহস্য উপন্যাস মাসুদ রানা সিরিজের ২৬০টি ও কুয়াশা সিরিজের ৫০টি বইয়ের লেখক হিসেবে দাবি করেন এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কপিরাইট আইনের ৭১ ও ৮৯ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে যথাযথ প্রতিকার প্রার্থনা করেন।

এর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের যুক্তি হচ্ছে – সেবা প্রকাশনীতে অভিযোগকারি নিয়মিত চাকরি করতেন। চাকরিতে নিয়োজিত থেকে প্রতিপক্ষের অনুপ্রেরণায় ও নিয়োগকর্তার নির্দেশনায় তিনি যে বইগুলো লিখেছেন, এর স্বত্বাধিকারী তিনি নন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর পাল্টা যুক্তি হলো - তিনি কখনই সেবা প্রকাশনীতে চাকরি করেননি। রয়্যালিটির বিনিময়ে লেখক হিসেবে সেবা প্রকাশনীতে সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর লিখে গেছেন। আবেদনকারী যে, সেবা প্রকাশনী তথা প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানের একজন চাকরিজীবী ছিলেন, এর স্বপক্ষে কোন ডকুমেন্টস প্রতিপক্ষ উপস্থাপন করেননি। ফলে উক্ত অভিযোগের কোন প্রমান বা ভিত্তি নেই।অধিকন্তু লেখক চাকরিজীবী হলেও পাণ্ডুলিপি প্রণেতা হিসেবে রচিত লেখার তিনিই মূল স্বত্বাধিকারী। প্রণোদনা, পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা চাকরি দিয়ে কারও রচনা নিজের বলে দাবি করা যায় না। যদি যেতো তাহলে "আকবরনামার" লেখক হতেন সম্রাট আকবর, পন্ডিত আব্দুল ফজল নন।

বস্তুত:পক্ষে কপিরাইট আইন অনুসারে সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে যিনি কর্মটি রচনা করেন তিনিই কপিরাইটের মালিক। দেশের খ্যাতিমান কপিরাইট আইন বিশারদ, সাবেক জেলা জজ ও কপিরাইট বোর্ডের সাবেক সভাপতি সুবিখ্যাত আইনবেত্তা মরহুম গাজী শামসুর রহমান প্রনীত "কপিরাইট আইনের ভাষ্য" নামক গ্রন্থে কপিরাইট সংক্রান্ত অনেক মামলার রেফারেন্স উল্লেখ করেন। প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এখানে কয়েকটি মামলার রেফারেন্স উল্লেখ করা হলো। সাহিত্যকর্মের রচয়িতা হবেন সে ব্যক্তি যিনি ব্যখ্যা ও ভাবনা সৃষ্টি করেন। Samvelson vs. Producers Distributing Co. Ltd (1ch201) নামক মামলায় রায় দেয়া হয় যে, "নাট্যকর্মের আসল লেখক, অন্য ব্যক্তি কর্তৃক উহাতে পরিবর্তন আনা স্বত্ত্বেও, একক রচয়িতা হিসেবে গন্য হয়।" আবার kenrich & Co. vs. Lawrence of co. 25 QBD 99 মামলায় রায় দেয়া হয় যে, "কোন ব্যক্তি যদি কেবল কোন বিষয় বা পদ্ধতি এবং ব্যবহার প্রস্তাব করেন তবে তিনি রচয়িতা হতে পারেন না।" এছাড়া Walter vs. Lane (1900) AC 539 নং মামলায় আরও পরিষ্কারভাবে নিষ্পত্তি প্রদান করা হয় যে, "কোন ব্যক্তি কর্তৃক কেবল কোন গল্প বা উপন্যাসের ঘটনা বা প্লট কিংবা ছবির বিষয়বস্তু লেখকের কাছে বা শিল্পীর কাছে প্রস্তাব বা প্রকাশ করে তাহলে সে গল্প, উপন্যাস বা ছবির রচয়িতা হয় না।"

প্রতিপক্ষ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, অভিযোগকারীর লিখিত "জাল" বইটি যেহেতু কিছু টাকার বিনিময়ে একবার মূদ্রনের জন্য প্রতিপক্ষকে প্রদানের কথা নিজ ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন, সেহেতু উক্ত বই নকল করে প্রচারের অভিযোগ মিথ্যা। এ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর পাল্টা যুক্তি "জাল" বইটির প্রথম মূদ্রনে লেখক হিসেবে তার নাম ছাপা হলেও পরবর্তী ৩য় মূদ্রনে তার নাম ছাপানো হয়নি। লেখক হিসেবে কাজী আনোয়ার হোসেন তার নিজের নাম মুদ্রিত করে বইটি ছাপিয়েছেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত "জাল" বইটির ৩য় সংস্করণ পর্যবেক্ষণক্রমে এটা প্রমাণীত হয় যে, "জাল" বইটি অভিযোগকারী কর্তৃক লিখিত এবং প্রণেতা হিসেবে ২০১৯ সালেই উক্ত বইটির কপিরাইট সনদও তার অনুকূলে ইস্যু করা হয়েছে। ফলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানীত হয় যে, উক্ত বইটির লেখক শেখ আব্দুল হাকিম। বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের ৬০ ধারা অনুসারে কপিরাইট সনদ যে কোন আদালতে আপাত: সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচ্য। অধিকন্তু কপিরাইট আইনের ৯৫ ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রারের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে কপিরাইট বোর্ডের নিকট আপিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রতিপক্ষ তা করেননি। ফলে উক্ত বইটির নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকারী শেখ আবুদল হাকিম। অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী লেখক একবারের জন্য উক্ত বইটি মূদ্রনের জন্য প্রকাশককে অনুমতি দিয়েছিলেন। একাধিক বারের জন্য নয়। অথচ প্রকাশক বইটির ৩য় মূদ্রণও প্রণেতার সম্মতি ছাড়া প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের ৭১ ধারা অনুসারে কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত কিংবা রেজিস্ট্রারের প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া বা লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গাকৃত কার্য কপিরাইট লংঘন মর্মে গণ্য। অতএব, প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে "জাল" বইয়ের ৩য় সংস্করন প্রকাশ করে কপিরাইট আইনের ৭১ ধারা লংঘন করেছেন মর্মে প্রমাণীত হয়। এছাড়া উক্ত বইটির লেখক না হওয়া স্বত্বেও প্রতিপক্ষ লেখক হিসেবে নিজের নাম বইটির প্রচ্ছদে মূদ্রণ করে কপিরাইট আইনের ৮৯ ধারা লঙ্ঘন করেছেন মর্মে আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। কপিরাইট আইন অনুসারে প্রণেতার স্বত্বের নৈতিক অধিকার (Moral Right) কোন অবস্থায়ই হস্তান্তরযোগ্য নয়। শেক্সপিয়ার, রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের রচনাবলী তাদের নামেই ছাপাতে হবে। এমনকি তারা তাদের স্বত্ব লিখিতভাবে কোন পক্ষকে দান বা হস্তান্তর করে গেলেও প্রণেতা হিসেবে তাদের নামের স্থলে অন্য কারও নাম প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। কেবল লিখিত চুক্তি থাকলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন গ্রন্থের গ্রন্থস্বত্ব তথা বাণিজ্যিক স্বত্ব লাভ করা যায়। কিন্তু প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর সংগে সম্পাদিত কোন লিখিত চুক্তির কপি উপস্থাপন করতে পারেননি। তবে অভিযোগকারী স্বীকার করেন যে, তিনি "জাল" বইটির ১ম সংস্করণের জন্য রয়্যালটি পেয়েছেন। অন্য কোন সংস্করনের জন্য তার অনুমতি গ্রহণ বা রয়্যালটি প্রদান করা হয়নি। এমনকি প্রণেতার সম্মতি থাকলেও তার পরিবর্তে লেখক হিসেবে নিজের নাম প্রকাশ করাও নৈতিকতার পরিপন্থি। কারন এ ধরনের কার্যক্রম পাঠকের সংগে অনেকটাই প্রতারনার সামিল।

প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর ভাষ্যকে ভিত্তি করে যুক্তি তুলে ধরেন যে, যেহেতু তিনি নিজের বক্তব্যেই উল্লেখ করেন যে, তার কোন ইংরেজি দক্ষতা নেই। ফলে ইংরেজি বইয়ের গল্প অবলম্বনে কাহিনী তৈরি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা প্রকাশকের নির্দেশনায় লিখেছেন। তদুত্তরে অভিযোগকারী জানান যে, "আমি সে রকম ইংরেজি জানি না, আর আমার ইংরেজি দক্ষতা নেই" এ দুটি বাক্য এক নয়। ইংরেজি না জানলে ইংরেজি বই অবলম্বনে "জাল" কিভাবে রচনা করলাম। তিনি তাঁর রচিত ও প্রদর্শিত অনেক ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন।

উভয়ের বক্তব্য ও ডকুমেন্ট পরীক্ষাক্রমে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা অত্যন্ত দুর্বল ও গ্রহণযোগ্য নয়। অভিযোগকারী ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে তার রচিত ও প্রকাশিত অনেক বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের লেখক হিসেবে প্রমান দাখিল করেন।

প্রতিপক্ষের একটি জোরালো যুক্তি হলো যে, যে বইগুলো প্রকাশিত ও যেগুলোতে আবেদনকারীর কোন নাম নেই বরং লেখক হিসেবে প্রতিপক্ষের নাম আছে, সেগুলোর মালিকান স্বত্ব কোন অবস্থায়ই অভিযোগকারী দাবি করতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে আবেদনকারীর যুক্তি হচ্ছে প্রথমত: কাজী আনোয়ার হোসেন নিজেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় একাধিক সাক্ষাতকারে বহুবার বলেছেন যে, তিনি মাসুদ রানা লিখেন না। অভিযোগকারীসহ অন্যান্য কয়েকজন লেখক লিখে থাকেন। মাসুদ রানা সিরিজের 'অটল সিংহাসন' ও 'প্রমাণ কই' বইয়ের আলোচনা বিভাগে কাজী আনোয়ার হোসেন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি আর মাসুদ রানা লিখেন না। কুয়াশা সিরিজের ৩৭ নম্বর বইয়ের আলোচনা বিভাগে তিনি স্বীকার করেছেন যে শেখ আব্দুল হাকিম কুয়াশা সিরিজ লিখে থাকেন। দ্বিতীয়ত: তিনি তার লিখিত অধিকাংশ বইয়ের উৎসের কথা বলতে পারবেন যে, উক্ত বইগুলো কোন বইয়ের অবলম্বনে লিখা হয়েছিলো। তিনি ১৯৬৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সেবা প্রকাশনীতে রয়্যালটির বিনিময়ে মাসুদ রানা সিরিজের ২৫০টি ও কুয়াশা সিরিজের ৫০টিসহ মোট ৩১০টি বই লিখে গেছেন। তৃতীয়ত: অভিযোগকারী যে মাসুদ রানা লিখতেন এর প্রমানস্বরূপ তিনি তার বরাবর কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের স্বহস্তে লিখিত চিঠির ফটোকপি প্রদর্শন করেন। চতুর্থত: "খুনে মাফিয়া" নামক বইয়ের মূল পান্ডুলিপি এখনও তার কাছে আছে। পঞ্চমত: দুটো বিদেশি বই অবলম্বনে মাসুদ রানা সিরিজের ৩৪৩ নম্বর "মিশন তেল আবিব" নামক বইটি লিখা হয়েছিলো। কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেব কেবল একটি বইয়ের নাম জানেন, দ্বিতীয়টির নয়। ষষ্ঠতঃ আবেদনকারী এদেশের বেশ কিছু খ্যাতিমান সাহিত্যিক, প্রচ্ছদ শিল্পী ও সেবা প্রকাশনীর কর্মচারির নাম স্বাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করে দাবি করেন যে তিনি সেবা প্রকাশনীতে দীর্ঘ দিন মাসুদ রানা ও কুয়াশা সিরিজের বই লিখেছেন, তাদের সাক্ষ্য থেকে এটি প্রমানিত হবে।

যে বইগুলো কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের নামে মূদ্রিত এবং দীর্ঘদিন ধরে লেখক যার কোন প্রতিবাদ করেননি, সে বইগুলোর লেখক স্বত্ব প্রমাণ করা বেশ জটিল। তবে আবেদনকারী তার লিখিত যে বইগুলোর তালিকা দিয়েছেন, সে বইগুলো কোন বই অবলম্বনে রচিত হয়েছে এর অধিকাংশেরই সূত্র তিনি উল্লেখ করতে সক্ষম মর্মে দাবি করেন। এদেশের প্রথিতযশা প্রচ্ছদ শিল্পী হাসেম খান, লেখক বুলবুল চৌধুরী, শওকত হোসেন, সর্বোপরি সেবা প্রকাশনীর এককালীন ব্যবস্থাপক ইসরাইল হোসেন খান অভিযোগকারীকে সেবা প্রকাশনীতে দীর্ঘদিন ধরে লেখক হিসেবে কাজ করেছেন মর্মে লিখিত বক্তব্য দিয়েছেন। তবে কোন বই তিনি লিখেছেন তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। কেবল ব্যবস্থাপক ইসরাইল হোসেন খান তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, শেখ আব্দুল হাকিম লাল পাহাড়, বিদায় রানা, গ্রাস, জিপসী, প্রতিদ্বন্ধী, স্বর্ণতরী, পপি, শান্তিদূত, বন্ধী গগল, অপহরণসহ আরো অনেক বইয়ের পান্ডুলিপি সেবা প্রকাশনীতে জমা দেন। উক্ত বইসমূহের রয়্যালিটি তিনি নিজ হাতে তাকে পরিশোধ করেছেন। আবেদনকারী বরাবর প্রতিপক্ষের স্বহস্তে লিখিত পত্র থেকেও আবেদনকারী কর্তৃক মাসুদ রানা সিরিজ ও কুয়াশা সিরিজের বই লিখার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রদত্ত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রতিপক্ষ স্বীকার করেন যে, অন্যান্য কতিপয় লেখকের সংগে আবেদনকারীও মাসুদ রানা সিরিজের বই লিখে থাকেন। এছাড়া নিজের প্রকাশিত বইয়ের পাঠকের জবাবেও প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, তিনি এখন আর মাসুদ রানা বা কুয়াশা লিখেন না। মাসুদ রানা সিরিজের 'খুনে মাফিয়া' ও 'মিশন তেল আবিব' বই দু'টো যে আবেদনকারীর

লিখিত এ বিষয়ে আবেদনকারী স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ দাখিলে সক্ষম হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অথচ বই দুটোতে লেখক হিসেবে আবেদনকারীর পরিবর্তে প্রতিপক্ষের নাম মূদ্রিত হয়েছে। আবেদনকারী কর্তৃক ১৯৬৭ সন থেকে ২০০৮ সন পর্যন্ত সেবা প্রকাশনীতে লেখক হিসেবে কাজ করে যাওয়ার বিষয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি খন্ডন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, "এতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি সেবা প্রকাশনীতে নিয়মিত চাকরি করতেন। সে চাকরিতে থেকে মালিকের নির্দেশে যে সকল বই লিখেছেন, তা অভিযোগকারী নিজের সম্পদ মর্মে দাবি করতে পারেন না"। প্রতিপক্ষের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, অভিযোগকারীই তার দাবিকৃত সময়কালে রচিত বইগুলোর লেখক বা রচয়িতা। আবেদনকারীর বক্তব্যের বিপরীতে "অভিযোগকারীর দাবিকৃত বইগুলো তিনি সেবা প্রকাশনীতে চাকরিরত অবস্থায় ও মালিকের নির্দেশে লিখেছেন" মর্মে প্রদর্শিত যুক্তি প্রকারন্তরে অভিযোগকারীর দাবিকেই প্রতিষ্ঠা করে।

মাসুদ রানা সিরিজের "জাল" (প্রথম সংস্করন ব্যতীত), "খুনে মাফিয়া" ও "মিশন তেল আবিব" ও কুয়াশা সিরিজের অভিযোগকারী রচিত বইয়ে প্রকৃত লেখকের পরিবর্তে নিজের নাম মূদ্রনের ফলে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বনের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কোন পক্ষই এখনও এই বইগুলোর কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেননি। কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হলে, উক্ত আবেদনের রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়াকালে এর স্বত্ব সম্পর্কে শুনানী গ্রহণপূর্বক যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

অভিযোগকারী একই বিষয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ৩১/০৩/২০১০ ইং তারিখে কপিরাইট অফিসে অভিযোগ দাখিল করেন এবং ২৯-০৪-২০১০ ইং তারিখে দাবিকৃত অভিযোগের বিষয়ে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে মর্মে প্রতিপক্ষ যুক্তি উপস্থাপন করেন। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রমান দাখিল করতে পারেননি। ফলে প্রতিপক্ষের এ যুক্তি ভিত্তিহীন।

অপর এক যুক্তিতে প্রতিপক্ষ কপিরাইট আইনের ৮১ ধারা এবং ৯২ ধারার আলোকে অভিযোগকারীর ৭১ ও ৮৯ ধারার অভিযোগ দেওয়ানী ও ফৌজদারি ব্যতীত অন্য কোন আদালতে বিচার্য নয় মর্মে দাবি করেন। "কপিরাইট আইন" প্রণীত হয়েছে মূলত কপিরাইট স্বত্ত্বাধিকারীগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও এর সুরক্ষা প্রদানের জন্য এবং কপিরাইট অফিস স্থাপন করা হয়েছে কপিরাইট আইনের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের জন্য। কপিরাইট আইনের ২(৯) ধারায় রেজিস্ট্রারকে এ আইন দ্বারা বা এর আওতায় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের অধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ আইনের ৯৯ ধারায় কপিরাইট রেজিস্ট্রার ও বোর্ডকে দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে কোন দেওয়ানী মামলার বিচার করা কালে কোন ব্যক্তিকে সমন প্রদান, উপস্থিতি নিশ্চিত ও উপস্থাপনপূর্বক পরীক্ষা করা, কোন দলিল প্রদর্শন ও উপস্থাপন করানো, হলফনামাসহ স্বাক্ষ্য গ্রহন, সাক্ষ্য বা দলিল পরীক্ষার জন্য কমিশন মঞ্জুর, কোন আদালত বা কার্যালয় হতে গেলে সরাসরি নথি বা এর অনুলিপি তলব ইত্যাদির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আবার কপিরাইট আইনের ১০০ ধারায় রেজিস্ট্রার ও বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ প্রদানের আদেশ সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির ন্যায় কার্যকর হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু কপিরাইট আইনে ১২(৫) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বোর্ড একটি দেওয়ানী আদালতরূপে গণ্য হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডের নিকট উপস্থাপিত সকল বিষয় দ: বি: ১৯৩ ও ১২৮ ধারার ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে। আবার কপিরাইট আইনের ৭৮ ধারায় প্রণেতাকে বিশেষ অধিকার দেয়া হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন কর্মের প্রণেতা ঐ কর্মের কপিরাইট স্বত্ব নিয়োগ বা পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও কর্মটির রচনা স্বত্ব দাবি করতে

পারবেন এবং উক্ত কর্মের বিকৃতি বা অন্যান্য পরিবর্তন সম্পর্কে ক্ষতিপূরন বা কর্মের উপর নিবারন দাবি করতে পারবেন।

বাংলাদেশে কপিরাইট আইন প্রবর্তন, কপিরাইট অফিস প্রতিষ্ঠা ও কপিরাইট আইনের বর্ণিত ধারাসমূহের আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, যে কোন কপিরাইট স্বত্ত্বাধিকারীর বাংলাদেশে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে, যথা প্রশাসনিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারী। এক্ষেত্রে কপিরাইট রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদনকারী কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। আবেদনকারী কপিরাইট আইনের ৭৬ ধারার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালতে যেমন দেওয়ানি প্রতিকার পেতে পারেন, তেমনি কপিরাইট বোর্ডেও এ প্রতিকার দাবি করতে পারেন। কারন বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের ১২(৫) ধারা অনুযায়ী কপিরাইট বোর্ডকে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে ৮৯ ধারায় বর্ণিত কপিরাইট সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিচার কেবল দায়রা আদালতেই বিচার্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

পর্যবেক্ষণ:

- অভিযোগকারী নিজেকে সেবা প্রকাশনীতে রয়্যালিটির বিনিময়ে লেখক হিসেবে দাবি করেন। এদেশের বেশ কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি যারা সেবা প্রকাশনীতে লিখেছেন, তারাও এ দাবিকে সমর্থন করেন। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত প্রতিপক্ষ (কাজী আনোয়ার হোসেন) এর বক্তব্যে মাসুদ রানা সিরিজের বই লিখার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেন- "আড়ালে থেকে মাসুদ রানা ও কুয়াশা সিরিজের বই যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেককেই তুমি চেনো। বিভিন্ন সময় যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কমবেশি প্রাপ্তিযোগের প্রত্যাশাতেই লিখেছেন। তাঁরা সবাই বড় লেখক। অন্যের নামে লিখলেও নিজের নামে বই লেখার ক্ষমতা যে তাঁদের নেই, এমনতো নয়। তাঁদের নাম বলে দিয়ে তাঁদের প্রতি অবিচার করা কি ঠিক হবে? যিনি রানার কাহিনী লিখতে আগ্রহী, তিনি প্রথমে কোনো একটি ইংরেজি বইয়ের কাহিনী সংক্ষেপ জমা দেন। কাহিনী পছন্দ হলে আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে বুঝিয়ে দেই কিভাবে কাহিনী এগাবে, রানা কিভাবে আসবে, কি করবে ও কি করবে না। মাসখানেক পরিশ্রমের পর তাঁর লেখা শেষ হয়, তখন পান্ডুলিপিটি আমি পড়ি। যেসব জায়গায় সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন, সেগুলো চিহ্নিত করে টীকাসহ লেখককে ফেরত দিই। তিনি আবার ঠিকঠাক করে দিলে চূড়ান্তভাবে আর একবার দেখি ও সম্পাদনা করি। এসবে আমার লেগে যায় পনেরো দিনের মতো। তার পরই রানা বই আকারে ছাপা হয়"। তার এ বক্তব্য দেশের খ্যাতিমান প্রচ্ছদ শিল্পী জনাব হাশেম খানের লিখিত বক্তব্যের সংগে প্রায় হুবহু মিলে যায়। যা অভিযোগকারীর দাবিকে প্রতিষ্ঠা করে।

- এদেশের বিখ্যাত কয়েকজন লেখক ও সেবা প্রকাশনীতে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত ব্যবস্থাপকের বক্তব্য এবং কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে প্রমাণীত হয় যে, অভিযোগকারী শেখ আব্দুল হাকিম সেবা প্রকাশনীতে রয়্যালিটির বিনিময়ে পান্ডুলিপি জমা প্রদান করতেন। উভয়ের মধ্যে লেখক - প্রকাশকের সম্পর্ক থাকলেও কোন লিখিত চুক্তিপিত্র ছিলনা। এর ফলেই এ দ্বন্ধের উদ্ভব। এবিষয়ে দেশের খ্যাতিমান লেখক-অনুবাদক জনাব শওকত হোসেন উল্লেখ করেন যে, "জনাব হাকিম যে মাসুদ রানা সিরিজের বইগুলো লিখতেন সে সময়ে সেবা প্রকাশনীর সংগে বিভিন্ন ভাবে জড়িত লেখক-প্রচ্ছদ শিল্পীরা জানতেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত শিল্পী ধ্রুব এষ, আসাদুজ্জামান, শরাফত খান, জাহিদ হাসান, আলীম আজিজ প্রমুখ অন্যতম"। বিখ্যাত লেখক বুলবুল চৌধুরী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, "কর্মজীবনের শুরু থেকে ২০০৮

সালের প্রায় কয়েক মাস পর্যন্ত জনাব হাকিম নিয়মিত কুয়াশা, মাসুদ রানা, ওয়াল নামের সিরিজের বেশিরভাগ বই লিখেছেন তিনি, এটা আমার এবং বহু মানুষের সামনে।" এদেশের প্রখ্যাত প্রচ্ছদ শিল্পী হাশিম খান তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, লেখালিখি ও পান্ডুলিপিকে কেন্দ্র করেই দুপক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। উভয়ের দ্বন্ধ নিরসনে তিনি তার বক্তব্যে এ মতামত প্রকাশ করেন-"বিশদভাবে খতিয়ে দেখা দরকার-লেখক ৩১০টি বই কেমন চুক্তিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশককে ছাপাতে ও বিপণন করতে দিয়েছেন। মালিকানা স্বত্বের বিষয়টি প্রতিটি গ্রন্থের চুক্তিপত্রে কীভাবে দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে? সমঝোতা বা সমন্বয় হয়েছে বলেইতো লেখক পরপর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ৩১০ টি বই লিখেছেন বলে দাবী করেছেন। এতোদিন দুপক্ষের মধ্যে কোন বিবাদ ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়। দীর্ঘকাল ধরে লেখক কী কারণে চুপচাপ থেকে একের পর এক বই লেখে গিয়েছেন? তাই বিষয়টি হিসেব করে দেখা দরকার ৩১০টি বইয়ের কয়টি ফরমায়েশী লেখা গ্রন্থ এবং কয়টি মৌলিক গ্রন্থ। মৌলিক গ্রন্থের মালিকানা স্বাভাবিকভাবে লেখকেরই থাকে। তবে অনেক লেখক এককালীন অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রন্থস্বত্ব ও মালিকানা প্রকাশককে প্রদান করেন।"

- বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের উৎস ১৯৬২ সনের কপিরাইট অধ্যাদেশ, যা ১৯৭৪ সালে আইনে পরিণত হয়। উক্ত অধ্যাদেশের ১৪ ধারা অনুযায়ী রচয়িতা ১০ বছরের বেশি মেয়াদের জন্য তার স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেন না। ১০ বছরের বেশি সময়ের জন্য স্বত্ব হস্তান্তর করলেও তা কেবল ১০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এটি ১৮ জুলাই ২০০০ সালে সংশোধিত কপিরাইট আইন প্রণীত হওয়া পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ফলে এ সময়কালে অভিযোগকারী যদি তার স্বত্ব লিখিতভাবে হস্তান্তর করেও থাকেন, তবে তা কেবল ১০ বছরের জন্যই কার্যকর হবে, এর বেশি নয়।

- মোঃ ইসরাইল হোসেন খান দীর্ঘকাল সেবা প্রকাশনীতে বিক্রয় ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। অভিযোগকারী কর্মচারি ছিলেন না। পান্ডুলিপি জমা দিলে তাকে অগ্রিম কিছু টাকা দেওয়া হতো। পরে তিন মাস অন্তর বই বিক্রির অনুসারে টাকা দেওয়া হতো। সকল স্বাক্ষী উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং সম্পর্কিত বিষয় ও প্রেক্ষাপট পর্যালোচনাক্রমে এটা সুস্পষ্ট যে, শেখ আব্দুল হাকিম সেবা প্রকাশনীর নিয়মিত কর্মচারি ছিলেন না, তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেবা প্রকাশনীতে লিখা জমা দিতেন। যা পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ প্রয়োজন মাফিক সংশোধন এনে ছাপাতেন। বস্তুত:পক্ষে কাজী আনোয়ার হোসেন রচিত মাসুদ রানা এদেশের রহস্য উপন্যাস জগতে অত্যাধুনিকতার ছোঁয়া দিয়ে এক অসাধারণ পরিবর্তন এনে পাঠক সমাজে প্রচন্ড আলোড়ন ও তীব্র আকর্ষন সৃষ্টি করেছিলো। ফলশ্রুতিতে এদেশে "মাসুদ রানা" সিরিজের এক বিশেষ ব্র্যান্ড তথা বিশাল পাঠকশ্রেণী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে মাসুদ রানা সিরিজ প্রবর্তনের পর থেকেই এটি দেশের কিশোর, তরুন, যুবক এমনকি প্রৌঢ়বয়সীদের মাঝেও একটি ব্যতিক্রমধর্মী ক্রেজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, প্রতিপক্ষ কাজী আনোয়ার হোসেনই ছিলেন, এ সৃষ্টির পথিকৃৎ তথা মূল কারিগর। তিনিই মাসুদ রানাকে একটি বিশেষ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিচিতি ও রুপদান করেছিলেন। কাজী আনোয়ার হোসেন এবং মাসুদ রানা এদেশের পাঠক সমাজের কাছে প্রায় সমার্থকরূপে তুমুল জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি লাভ করেছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মাসুদ রানা ও কুয়াশা সিরিজের বইগুলো বিভিন্ন লেখককে দিয়ে লিখিয়ে উক্ত লিখার কিছু পরিবর্তন বা সম্পাদন করে নিজস্ব স্টাইলে মাসুদ রানা ও কুয়াশা সিরিজের উক্ত বইগুলো নিজের নামে (কাজী আনোয়ার হোসেন নাম) মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

- এটা স্বীকৃত যে, অভিযোগকারী সেবা প্রকাশনীর অন্যান্য লেখকের মতো পান্ডুলিপি জমা দিয়ে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সম্মানি গ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে বই বিক্রয়ের পর আরো টাকা পেতেন। সম্ভবত পাঠকের আকর্ষন ধরে রাখা ও বাজারজাত করার স্বার্থে প্রকাশক প্রকৃত লেখকের পরিবর্তে মাসুদ রানার বইগুলোতে নিজের নাম ব্যবহার করতেন। বিষয়টি মূল লেখক তথা অভিযোগকারীও জানতেন। এ ব্যাপারে অভিযোগকারীর কোন আপত্তি ছিল বলে মনে হয় না। তবে বিপত্তির মূল কারণ রয়্যালিটি। একটি বই যতো বেশি বিক্রয় ও লাভ হয়,স্বাভাবিকভাবেই এর একটি অংশ লেখকের প্রাপ্য। এর জন্য অবশ্যই বইটি প্রকাশের পূর্বেই লেখক-প্রকাশকের মধ্যে প্রকাশিতব্য বইয়ের সংখ্যা, পারিশ্রমিক ও কমিশন প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট চুক্তি থাকা উচিত। এ ধরণের চুক্তি থাকলে প্রকাশকই নিরাপদ। কারণ চুক্তির অবর্তমানে মেধা সম্পদের স্বত্ব প্রণেতার। বই প্রকাশকালে গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশকের নিজের নাম মুদ্রিত করে প্রকাশ করলেই উক্ত গ্রন্থের স্বত্ব প্রকাশকের হয়ে যায় না। মূল স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ প্রণেতার কাছ থেকে স্বত্ব লাভের এক আইনগত ভিত্তি দরকার - এটাই চুক্তিনামা। এধরনের কোন হস্তান্তর চুক্তিপত্র না থাকায় উভয়ের মধ্যে এ দ্বন্দ ও সমস্যার উদ্ভব। খ্যাতিমান প্রচ্ছদ শিল্পী জনাব হাশেম খান তার বক্তব্যে কপিরাইট অফিসের মধ্যস্থতায় এ দ্বন্দ নিরসনের পরামর্শ দিয়েছেন। অভিযোগকারী নিজেও তার বক্তব্যে স্বীকার করেন যে, তার জীবনের লেখালিখির শুরু সেবা প্রকাশনীর মাধ্যমে এবং সুদীর্ঘ প্রায় চার দশক সেবা প্রকাশনীতে লিখার মাধ্যমেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেছেন। মূলতঃ সেবা প্রকাশনী তথা কাজী আনোয়ার হোসেনই তাকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়তা করেছেন। সকল স্বাক্ষীই উভয়ের মধ্যে বরাবরই সুসম্পর্ক ও হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত প্রেক্ষাপটে এ দ্বন্দের সম্মানজনক ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের লক্ষ্যে উভয়ের গ্রহণযোগ্য কতিপয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা অধিকতর সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

- সার্বিক পর্যালেচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায় যে, অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কপিরাইট আইনের ৭১ ধারা ও ৮৯ ধারা লংঘনের অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষাপটে অভিযোগকারীকে প্রথমত: তার দাবি অনুযায়ী রচিত বইগুলোর কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্যে উপযুক্ত প্রমানসহ আবেদন করতে হবে। দ্বিতীয়ত: মাসুদ রানা সিরিজের "জাল" ও কুয়াশা সিরিজের ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ও ৪৩ নম্বর বইগুলো যেহেতু তার নামে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ ইস্যু হয়েছে সেহেতু উক্ত বইগুলোর রয়্যালটির দাবি ও ক্ষতিপূরন চেয়ে কপিরাইট বোর্ডে কিংবা দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তৃতীয়ত: তার নামে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনকৃত বই কোন স্টোর, বাজার বা গুদামজাত করা থাকলে তা জব্দ করার জন্য স্থানীয় থানা কিংবা কপিরাইট টাস্ক ফোর্সের নিকট আবেদন করতে পারেন। চতুর্থতঃ দায়রা আদালতে কপিরাইট আইনের ৮৯ ধারা লঙ্ঘনের প্রতিকার চাইতে পারেন অথবা উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সুষ্ঠু ও সম্মানজনক নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত :

সুষ্ঠু সমাধান ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে কপিরাইট বোর্ড বা বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহন পর্যন্ত আবেদনকারীর দাবিকৃত ও তালিকাভুক্ত বইগুলোর প্রকাশ বা বানিজ্যিক কার্যক্রম গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হলো। এছাড়া প্রতিপক্ষকে আবেদনকারীর কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রকাশিত বইগুলোর সংস্করন ও বিক্রিত কপির সংখ্যা এবং বিক্রয় মূল্যের হিসাব বিবরনী এ আদেশ জারির তারিখের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসে দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৪.০৮.২০২০

জাফর রাজা চৌধুরী
রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস